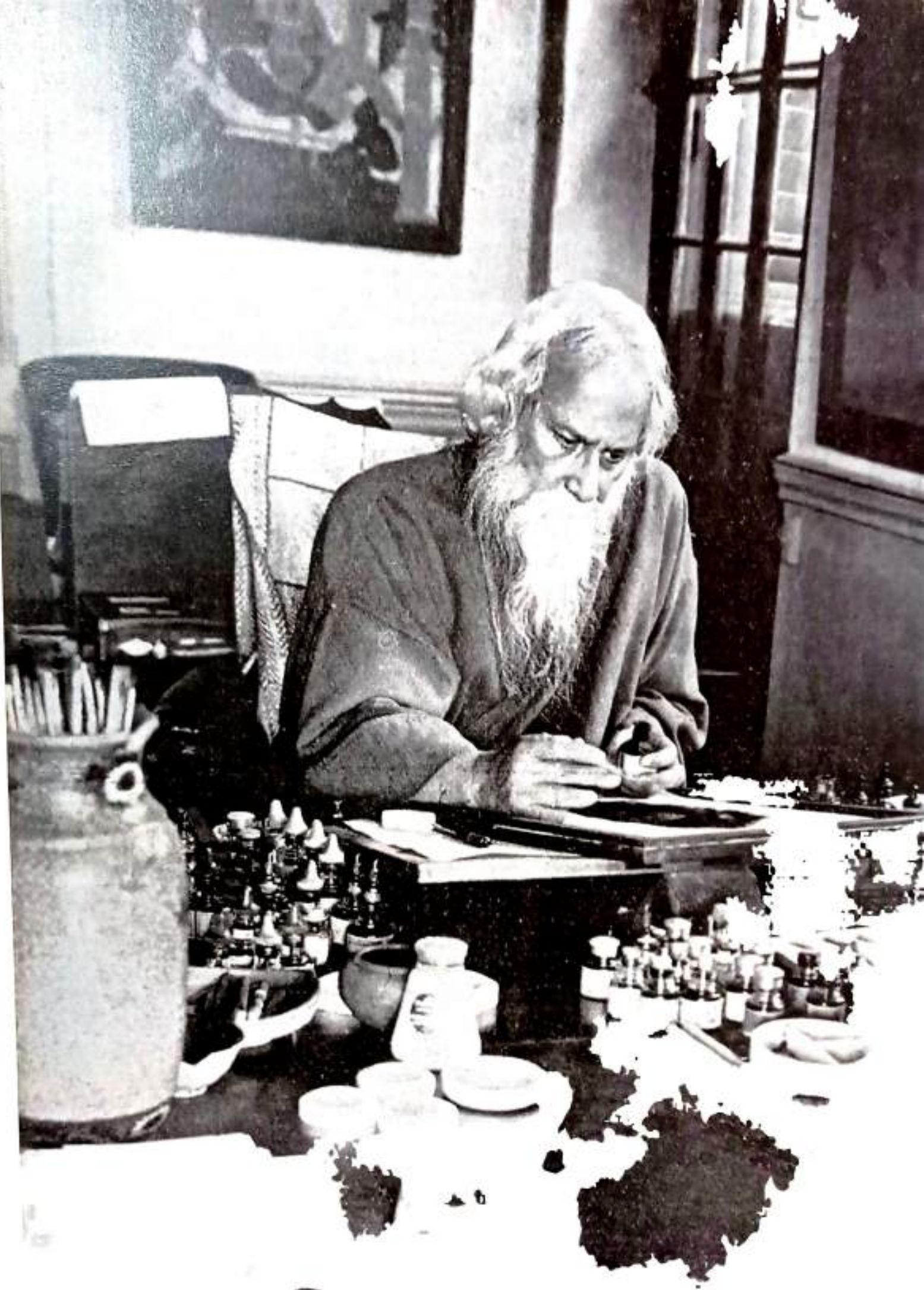

'যে কন্যাটি খান তিনিই চিত্রকলা, যিনি বাপের বাড়ি পলাতক, তিনি গান। কবিতাটি পূর্বস্নেহে এখনো রাঁধাবাড়া করেন।'[১]

সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছে একটু মজা করেই বলা রবীন্দ্রনাথের এই তিন সৃজন-কন্যার শেষোক্তটিকে আমরা আপাতত সরিয়ে রাখছি। কারণ প্রায় ষাট বছর ঘর করার ফলে তখন তিনি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের কাছে একরকম 'টেকেন ফর গ্র্যান্টেড', তার সঙ্গে আর তেমন সংরাগের সম্পর্ক নেই রবীন্দ্রনাথের। বাকি দুই, চিত্রকলা আর গান তখনও সজীব সৃজনের সংরাগে।

জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন। ১৯২৭-এ তুলির কাজ বা কলম দিয়ে রেখাঙ্কন সেই সূচনার প্রথম ধাপ। জীবনের যখন আর চোদ্দো বছর বাকি, তখন তাঁর সেই শেষ বয়সের নতুন প্রিয়া তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসল।

কিন্তু এটাও আকস্মিক নয়। এর একটা পূর্বভূমিকা ছিল কোথাও। বত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ঐ-যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ; তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হোলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।'[২]

হতাশ হওয়ার কথা বললেও হাল ছেড়ে দেননি রবীন্দ্রনাথ, মন তাঁর চিত্রবিদ্যার প্রতি ছিলই। *ছিন্নপত্র*-এর ওই চিঠির সাত বছর পরে জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখছেন,

'কুৎসিৎ ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্ছে...।'[৩]

দুটি উদ্ধৃতিতেই 'বিদ্যা' শব্দটার প্রতি একটু বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে আমাদের। ছবি আঁকাকে একটা 'ডিসিপ্লিন' হিসেবেই এ পর্যন্ত দেখছেন রবীন্দ্রনাথ, যাকে রীতিমতো শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। সেই অভ্যাস যে তিনি রীতিমতো পরিশ্রম করে করেছিলেন তার ইঙ্গিত ওই ঢের বেশি রবার চালানোর মধ্যে। আর, রাণু অধিকারীকে লিখেছেন, 'তুমি আমাকে ছবি আঁকা শিখতে বলেচ কিন্তু বৌমা কি সহজে শেখাবেন? তাঁর নিজের বিদ্যা অত সহজে কি দিয়ে ফেলবেন?'[৪]

বীথিকা-র প্রচ্ছদ

এর পরে ক্রমে ছবি আঁকার তথাকথিত 'বিদ্যা'কে আর আয়ত্ত করতে চাইবেন না রবীন্দ্রনাথ। তার চেয়ে বেশি জোর দেবেন আদিম শক্তির স্বতঃপ্রকাশের দিকে। ১৯২৭-এ তুলির কাজ বা কলম দিয়ে রেখাঙ্কন শুরুর বছর তিনেক আগে দিলীপকুমার রায়কে সে কথাটাই জানিয়েছেন, 'আমাকে তুমি রীতিমত তুলিচালন চতুর আর্টিস্ট পেয়েচ নাকি? আমি ছবি আঁকি দৈববশে—এতে আমার পুরুষকার কিছুই নেই। তাই আমার সেই আজগবি ছবি-আঁকিয়েকে কোনো চলতি কাজের কোনো ব্যবহারেই লাগাবার উপায় নেই। ওই হা-ঘরেটাকে আমার স্বদেশের লোকসমাজে প্রচার করতেও আমি অনিচ্ছুক—কেননা ওকে ওর জাতকুলশীল জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্নটাকে হেসে উড়িয়ে দেবে।'[৫]

দৈববশে, কিংবা ছুটির খেলার নেশাতেই, রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা। ছুটির বেলাকার খেলা একটা কিছু না থাকলে ছুটি ফাঁকা হয়ে পড়ে, সেই ভার বইতেই ছবিকে অবলম্বন করলেন রবীন্দ্রনাথ। শরীরের শক্তি তখন কমে আসছে, ক্লান্তির ধূসরতা নেমে আসছে মনের উপরে। লিখছেন, 'ছুটি নিতে চাই, কিন্তু ছুটির বেলাকার খেলা একটা কিছু না থাকলে যে ছুটি ফাঁকা হয়ে পড়ে, সেই ফাঁকার ভার বইবে কে? হেনকালে কাজের কোন একটা ছিদ্র দিয়ে আমাকে পেয়ে বসলো ছবি আঁকার নেশা।'[৬]

এই নতুন নেশা নিয়ে তাঁর সংকট ও সংকোচও কিছু কম ছিল না। জীবন-সায়াহ্নে এই নতুন মাধ্যমে তাঁর চর্চা কতটা অধিকারীর, আর কতটাই বা তার মধ্যে অনধিকারীর দ্বিধা, এ নিয়ে বার বার নানা চিঠিতে তাঁর সংকটের কথা প্রকাশিত হয়েছে। অনেক সময় বলতেন, 'লিখতে পারি তা আমি জানি, সেখানে আমার নিজের লেখার শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কিন্তু আঁকা সম্বন্ধে আজও আমার সংকোচ যায় না। আমি তো নন্দলাল অবনের মতো আঁকতে শিখিনি, তাই অনেক সময় মনে হয়, ওটা আমার পথ নয়।'[৭]

সে-র প্রচ্ছদ

'ওটা আমার পথ নয়', কথাটার একটা মানে নিশ্চয়, চিত্রকলাটাই রবীন্দ্রনাথের পথ নয়। আবার ব্যঞ্জনায় একটু স্বাধীনতা নিলে এ ভাবেও কথাটাকে দেখা যায় যে, যে ধরনের ছবি নন্দলাল-অবন আঁকেন তেমন ছবি আঁকা রবীন্দ্রনাথের পথ নয়। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিত্রকলার সাধনা এই দ্বিতীয় ব্যঞ্জনা-অর্থটিকে সমর্থন করে। নিজের দেশের সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা বিশ্বকবির সেই নতুন খেলা আর তার নতুন পথ এ দেশে তেমন গ্রহণীয় না হওয়ার অভিমানও তিনি প্রকাশ করেছেন নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে, 'কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর